التَّكْفِيرُ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ

তাকফীর

কঠোরতা ও শিথিলতার মধ্যবর্তী অবস্থানে

লেখা:
আল্লামা সলেহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

অনুবাদ:
সাফিন চৌধুরী

অনুবাদকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আমাদের ইসলামের নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গের উপর এবং তাঁর সকল সাহাবীর উপর।

অতঃপর:

তাকফীরের মাসআলা ইসলামি আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর একটি অধ্যায়। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন একদিকে খারিজী মানসিকতার মানুষেরা বিনা দলিলে মুসলিমদের উপর তাকফীর আরোপ করে রক্তপাত ঘটাচ্ছে, আর অন্যদিকে মুরজিয়া মানসিকতার মানুষেরা স্পষ্ট কুফরী কাজকেও কুফর বলতে অস্বীকার করছে, তখন এই বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে সম্মানিত শাইখ ডক্টর সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ, যিনি কিবা্রুল উলামা পরিষদের সদস্য এবং সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটির সদস্য, তাঁর এই মূল্যবান বক্তৃতাটি বাংলাভাষী মুসলিমদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল

জামাআতের মানহাজ অনুসরণ করে শাইখ হাফিযাহুল্লাহ এই বক্তৃতায় তাকফীরের বিষয়টিকে এত সুস্পষ্ট ও প্রামাণিকভাবে উপস্থাপন করেছেন যে এটি পাঠকের মনে বিষয়টি সম্পর্কে একটি সুদৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি মূল আরবি পাঠের প্রতি সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। একই সাথে বাংলাভাষী পাঠকের কাছে বিষয়বস্তু যেন সহজবোধ্য হয় সেদিকেও দৃষ্টি রেখেছি। কুরআনের আয়াতসমূহ এবং হাদীসের ক্ষেত্রে মূল আরবি পাঠ অক্ষুণ্ণ রেখে তার পাশে বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। হাদীসের রেফারেন্সসমূহ মূল কিতাব থেকে হুবহু সংযোজন করা হয়েছে। এই অনুবাদকর্মে কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা সম্পূর্ণ আমার অজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে। সেক্ষেত্রে পাঠকদের নিকট সুধী মতামত ও সংশোধনী প্রত্যাশা করছি।

পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এটিকে বাংলাভাষী মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণের উপকরণ বানিয়ে দেন। আমীন।

সাফিন চৌধুরী

www.shafinchowdhury.com

সংকলকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূলগণের উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর উত্তম দরুদ ও সালাম।

অতঃপর:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা অন্যান্য মতবাদের মাঝে মধ্যপন্থী অবস্থানে রয়েছে। তন্মধ্যে তাকফীরের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান মধ্যপন্থী; একদিকে মুরজিয়াহদের মধ্যে যারা কাউকে একেবারেই কাফির বলে না এবং অপরদিকে খারিজি ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে যারা কবীরা গুনাহের কারণে কাউকে কাফির বলে ফেলে, তাদের মাঝে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত কেবল তাকেই কাফির বলে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কাফির বলেছেন এবং তা এমন কিছু শর্ত ও নিয়মাবলির আওতায় যা আলিমগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

তাকফীর একটি জটিল ও গুরুতর বিষয়, আলিমগণ তা সুস্পষ্ট ও সুব্যাখ্যা করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁরা স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। আমাদের যুগের আলিমদের মধ্যে আমাদের সম্মানিত শাইখ ডক্টর

সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান, যিনি সিনিয়র উলামা পরিষদের সদস্য এবং স্থায়ী ফতোয়া কমিটির সদস্য, তিনি অন্যতম।

আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে আমি তাঁর সম্মানিত মহাশয়ের একটি বক্তৃতায় উপস্থিত হতে পেরেছিলাম, যার শিরোনাম ছিল: আত-তাকফীর বাইনাল ইফরাত্বি ওয়াত-তাফরীত্বি - অতিরঞ্জন ও শিথিলতার মধ্যবর্তী অবস্থানে তাকফীর । বক্তৃতার পর আমি তাঁর সম্মানিত মহাশয়ের নিকট কল্যাণ ও উপকারের বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে তা প্রকাশ করার প্রস্তাব পেশ করি, তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করেন। ফলে আমি তা লিখিত রূপ দান করি এবং তিনি ধন্যবাদপূর্বক ও সওয়াবের পাত্র হয়ে তা সংশোধন করে দেন।

উপসংহারে আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি একে তাঁর মহিমান্বিত সত্তার জন্য একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত হিসেবে কবুল করেন।

ফাহদ ইবনে ইবরাহীম আল ফুআইম

অনুমতিপত্র

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অতঃপর:

শাইখ ফাহদ ইবনে ইবরাহীম আল ফুআইমকে আমি আমার বক্তৃতা (আত-তাকফীর বাইনাল ইফরাত্বি ওয়াত-তাফরীত্বি - অতিরঞ্জন ও শিথিলতার মধ্যবর্তী অবস্থানে তাকফীর) মুদ্রণের অনুমতি প্রদান করলাম। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আমাদেরকে ও তাকে উপকারী জ্ঞান ও সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক দান করুন।

আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

লিখেছেন

সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

হাইয়াতু কিবারিল উলামা এর সদস্য

লাজনাতুদ দাইমাহ লিল-ইফতা এর সদস্য

তারিখ: ১২/১১/১৪২৮ হিজরী

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وبعد: فقد أذنت للشيخ فهد بن إبراهيم الفهيم بطباعة محاضرتي:

(التكفير بين الإفراط والتفريط) جزاه الله خيرًا ورزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

كتبه

صالح بن فوزان الفوزان

١٤٢٨/١١/١٤هـ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, যিনি বলেছেন: তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির আর কেউ মুমিন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।[1]

আর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর।

অতঃপর:

এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটি একটি পুরাতন জটিল বিষয় বটে, কিন্তু বর্তমান যুগে নানাবিধ কারণে তা আবার নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির স্বল্পতা এবং অধিকাংশ মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণের ব্যাপকতা, আর প্রবৃত্তির অনুসরণ অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। তাই তাকফীরের এই অধ্যায় তথা অতিরঞ্জন ও শিথিলতার মাঝে তাকফীরের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। আলিমগণ রহিমাহুমুল্লাহ তাঁদের রচনাবলিতে এবং বিশেষ করে আকীদার কিতাবসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

---

[1] সূরা আত-তাগাবুন: ২

আর কুফর হচ্ছে ঈমানের বিপরীত। ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান, আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এবং তাকদীরের ভালো মন্দের প্রতি ঈমান। ঈমানের রয়েছে বহু বৈশিষ্ট্য ও অসংখ্য শাখা প্রসাখা। তার সর্বোচ্চ শাখা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া এবং লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। ঈমান গঠিত হয় মুখের উচ্চারণ, অন্তরের বিশ্বাস এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের সমন্বয়ে। তা আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং পাপের মাধ্যমে হ্রাস পায়। এটাই হলো ঈমান। আল্লাহ তাআলা এর নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য একে পছন্দ করেছেন। আর এ দিকেই মানুষকে আহ্বান ও তার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য তিনি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরকে অপছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾

যদি তোমরা কুফরী কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। আর কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।[2] সুতরাং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে এটাই পছন্দ করেন যে তারা যেন তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং তিনি তাদের জন্য কুফরীকে অপছন্দ করেন। অথচ তিনি তাদের ঈমান ও ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। তাদের ঈমান তাঁর রাজত্বে বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি সাধন করে না এবং তাদের কুফরী ও শির্কও তাঁর রাজত্ব থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করতে পারে না। তিনি তাদের থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

যদি তোমরা কুফরী কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। আর কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।

---

[2] সূরা আয-যুমার: ৭

অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে।

﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾

আর মূসা বলেছিল, যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলে কুফরী কর তবু নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।[3]

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের আনুগত্য ও ঈমানের আদেশ দিয়েছেন তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই। আর তিনি তাদের শির্ক ও অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেছেন, যাতে তাদের থেকে অকল্যাণ ও ক্ষতি দূরীভূত হয়।

---

[3] সূরা ইবরাহীম: ৮

কুফরের প্রকারভেদ

আর কুফর বিভিন্ন প্রকারের। তন্মধ্যে রয়েছে জুহুদ। আর তা হলো সৃষ্টিকর্তা সুবহানাহুকে অস্বীকার করা। এটি নাস্তিকদের কুফর। আবার তাঁর তাওহীদ এবং ইবাদতে তাঁর একচ্ছত্র অধিকারকে অস্বীকার করার মাধ্যমেও কুফর সংঘটিত হয়। সুতরাং কুফর হলো ঈমানের বিপরীত এবং তার প্রকার একাধিক।

প্রথম প্রকার:

কুফরুল জুহুদ (كفر الجحود) তথা অস্বীকার করার কুফর

এটা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হলো সৃষ্টিকর্তা সুবহানাহু ওয়াতাআলাকে অস্বীকার করা ও তাঁর অস্তিত্ব মেনে না নেওয়া। যেমন নাস্তিক, প্রকৃতিবাদী ও বস্তুবাদীদের কুফর।

এবং শির্কের কুফর। যেমন মূর্তিপূজারীদের কুফর, যারা সৃষ্টিকর্তা সুবহানাহু ওয়াতাআলা এবং তাঁর প্রভুত্বকে স্বীকার করে কিন্তু ইবাদতে তাঁর সাথে অপরকে শরীক করে। সৃষ্টিজগতের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই এই অবস্থা বিদ্যমান। কেননা সৃষ্টির সিংহভাগের নিকট এই ধরনেরই শির্কের কুফর রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার: আশ-শিরক বিল্লাহ (আল্লাহর সাথে শির্ক করা)

আর তা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সাথে সমকক্ষ ও শরীক সাব্যস্ত করা।

তৃতীয় প্রকার: কুফরুন নিফাক্ব (মুনাফিকীর কুফর)

তা হলো প্রকাশ্যে ঈমান প্রদর্শন করা এবং অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখা। এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। কেননা এর মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের সাথে প্রতারণা করা হয়। আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি মুনাফিক ও কাফির সকলকে একত্রে জাহান্নামে সমবেত করবেন।

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾

তিনি বলেছেন: নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তুমি কখনো তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।[4]

অতএব বান্দারা এই বিভাজনের বাইরে নয়। হয় তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার এবং তারাই হলেন রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীবৃন্দ। অথবা তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে কাফির এবং তারাই হলেন অন্যান্য কাফির ও মুশরিক সম্প্রদায় যারা রাসূলগণ

---

[4] সূরা আন-নিসা: ১৪৫

আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের শত্রু, যদিও তারা আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ স্বীকার করে। আরেক দল হলো মুনাফিক, যারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রদর্শন করে কিন্তু অন্তরে কুফর গোপন রাখে এবং এটাই হলো আকীদাগত মুনাফিকী।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার শুরুতে এই তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সুবহানাহু বলেছেন:

﴿ الٓمٓ ۝ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾

আলিফ লাম মীম। এটাই সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক।[5] এটা প্রথম প্রকার।

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

যারা গায়েবে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা ঈমান আনে তার প্রতি যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে এবং আখিরাতের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তারাই তাদের

---

[5] সূরা আল-বাকারা: ১-২

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম।[6]

অতঃপর তিনি দ্বিতীয় প্রকারের কথা উল্লেখ করলেন, যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর সাথে কুফর করে। তিনি বললেন:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

নিশ্চয় যারা কুফর করেছে, তুমি তাদের সতর্ক করো বা না করো তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের শ্রবণশক্তিতে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।[7]

তারপর তিনি তৃতীয় প্রকারের কথা উল্লেখ করলেন, যারা প্রকাশ্যে ঈমান প্রদর্শন করে এবং অন্তরে কুফর গোপন রাখে, আর তারাই হলো মুনাফিক। তিনি বললেন:

---

[6] সূরা আল-বাকারা: ৩-৫

[7] সূরা আল-বাকারা: ৬-৭

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾

আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা মোটেও ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও যারা ঈমান এনেছে তাদের সাথে প্রতারণা করে। কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে প্রতারণা করে না, অথচ তারা তা অনুভব করে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তারা মিথ্যা বলত।[8] আয়াতসমূহের শেষে আল্লাহ তাআলা বলেন: তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না।[9]

অতএব আল্লাহ তাআলা বান্দাদের এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

আরেক প্রকার কুফর রয়েছে যা ঈমানের পর আপতিত হয়, তা হলো রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগের কুফর। মানুষ কখনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানদার, আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী এবং রাসূলুল্লাহ

---

[8] সূরা আল-বাকারা: ৮-১০

[9] সূরা আল-বাকারা: ১৮

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হওয়ার পর হঠাৎ তার উপর ধর্মত্যাগের অবস্থা আপতিত হয় এবং সে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরে যায়। রিদ্দাহর যে কোনো প্রকারের মাধ্যমেই হোক না কেন, যেমন সে ইসলামের কোনো একটি নাক্বিদ বা ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়, যে বিষয়গুলো আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাতে উল্লেখ করেছেন। আলিমগণ এসব বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সেগুলো নিরাময়কারী ব্যাখ্যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এই মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তওবা করার সুযোগ দেওয়ার পর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

«مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ»

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তোমরা তাকে হত্যা করো।[10]

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ؛ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

[10] সহীহ বুখারী: ২৭৯৪

আরো বলেছেন: কোনো মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়, যে সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিনটি কারণের কোনো একটি ব্যতীত: বিবাহিত ব্যভিচারী, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ এবং যে তার দ্বীন ত্যাগকারী ও জামাত থেকে বিচ্ছিন্নকারী।[11] আর এটাই সেই মুরতাদ যে ইসলাম গ্রহণের পর কুফর করে।

এটাই হলো কুফরের বিভাজন। হয় তা আকীদাগত (ইতিকাদী) ও অস্বীকারমূলক (জুহুদ) কুফর, নয় তা মুনাফিকীর (নিফাক্ব) কুফর, নয় তা রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগের কুফর, আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। কাজেই মুসলিম ব্যক্তি সর্বদা নিজের উপর, নিজের দ্বীনের উপর এবং নিজের ভাইদের উপর আশঙ্কিত থাকে যে তারা তাদের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং ইসলাম দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। শেষ যামানায় সংঘটিত ও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ফিতনার কারণে এরূপ হতে পারে।

« بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا »

---

[11] বুখারী: ৬৩০৭, মুসলিম: ৩১৭৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা নেক আমলের ব্যাপারে দ্রুত অগ্রসর হও, ঘোর অন্ধকার রাতের টুকরোগুলোর ন্যায় ফিতনা আসার পূর্বেই। সে ফিতনায় মানুষ সকালে মুমিন থাকবে আর সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। অথবা সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে আর সকালে কাফির হয়ে যাবে। সে তার দ্বীনকে দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে।[12]

কাজেই মুসলিম ব্যক্তি নিজের উপর রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগ থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা রাখে না। বস্তুত অনেক সম্প্রদায় রিদ্দাহ করেছে, যাদের বুদ্ধিমত্তা ছিল, যাদের জ্ঞান ছিল, যাদের উপলব্ধি ছিল। তারা ঘটমান ফিতনা ও অনিষ্টকর বিষয়ের কারণে ইসলাম দ্বীন থেকে ফিরে গেছে। আর এ কারণেই খলীল আলাইহিস সালাম তাওহীদের পর শির্কের ফিতনার ব্যাপারে নিজের উপর আশঙ্কা করেছিলেন, ফলে তিনি বলেছিলেন: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, এই শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের

---

[12] মুসলিম: ১৬৯, তিরমিযী: ২১২১, মুসনাদে আহমাদ: ৭৬৮৭

মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় এগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[13]

তাই তিনি নিজের উপর মূর্তিপূজার ব্যাপারে ভয় করেছিলেন। কেননা মুসলিম যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন সে রিদ্দাহ ও ফিতনার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কায় থাকে, তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা যাকে অবিচল রাখেন তার কথা ভিন্ন। বিশেষ করে বর্তমান যুগে পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারী ও ফিতনা সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা অনেক এবং তাদের হাতে এমন সব মাধ্যম রয়েছে যা পূর্বে ছিল না। তাদের হাতে রয়েছে ফিতনা সৃষ্টির মাধ্যম, শির্ক ও কুফরের দিকে আহ্বানের মাধ্যম এবং বহু মাধ্যম যা বিচ্যুত গণমাধ্যমের সাহায্যে মানুষের ঘরে ও তাদের বিছানায় আক্রমণ চালায়। তাই মানুষ নিজের উপর ভীত হয় এবং নিজের ও নিজের বংশধরের জন্য আল্লাহর নিকট অবিচলতার দোয়া করে। অতএব কুফর কখনো আক্বীদাগত কুফর হয়ে থাকে, কখনো মুনাফিকীর কুফর হয়ে থাকে এবং কখনো রিদ্দাহর কুফর হয়ে থাকে। আর মুসলিমের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো এই রিদ্দাহর কুফর।

---

[13] সূরা ইবরাহীম: ৩৫-৩৬

কুফরের হুকুম বা কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা

তবে কোনো মুসলিমকে কাফির বলে রায় দেওয়া অত্যন্ত গুরুতর ও ভয়াবহ বিষয়। এ দায়িত্ব কেবল আহলে ইলম ও আহলে বাসীরাহ অর্থাৎ জ্ঞানী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলিমগণই পালন করেন, যারা কিতাব ও সুন্নাহর দলিলসমূহের আলোকে রায় প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ ব্যক্তিরা হস্তক্ষেপ করতে পারে না, যদিও তাদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি আত্মিক টান ও ভালোবাসা বিদ্যমান থাকে। তাদের জন্য দীনি ইলম সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর উপলব্ধি ব্যতিরেকে এ বিষয়ে প্রবেশ করা জায়েয নয়। কেননা কাউকে কাফির আখ্যা দেওয়া অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। যখন কোনো মুসলিম তার ভাইকে বলে, হে কাফির, হে ফাসিক, হে আল্লাহর শত্রু, আর যদি সে বাস্তবে তেমন না হয় অর্থাৎ যাকে বলা হলো সে যদি সেরূপ না হয়, তাহলে এই অপবাদ উল্টে বক্তার উপরই পতিত হয়। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় নেই। অতএব মানুষের উচিত এই ভয়াবহ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিশ্চিত হওয়া এবং গভীর জ্ঞান ও সুচিন্তিত মত ছাড়া এতে প্রবেশ না করা। যাতে করে তাকফীরের ক্ষেত্রে পদস্খলিত হয়ে খারিজীদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায়। কেননা খারিজীরা তো কেবল এই পথ থেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। কারণ তারা রাসূলুল্লাহর সাহাবীগণের উপর এবং বিশেষ করে কয়েকজন খুলাফায়ে রাশেদীনের উপর, যেমন

উসমান ও আলীর উপর, কুফরের হুকুম আরোপ করেছিল। তাহলে তাদের চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষদের অবস্থা কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। খারিজীরা নিজেদের মূর্খতার কারণে এই পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে, অথচ তারা ছিল কঠোর ইবাদতগুজার, আল্লাহকে ভয় করত, অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করত, সিয়াম পালন করত এবং কুরআন তিলাওয়াত করত। কিন্তু তারা এই ভয়াবহ পথে পদার্পণ করায় পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় নেই।

« تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ»

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেছেন: তোমরা তাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে এবং তাদের সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যায় যেমন তীর শিকার ভেদ করে

বেরিয়ে যায়। সুতরাং যখন তোমরা তাদেরকে পাও, তখন তাদেরকে হত্যা করো। আমি যদি তাদেরকে পাই তবে অবশ্যই তাদেরকে আদ জাতির ন্যায় হত্যা করব। কেননা তাদের হত্যাকারীর জন্য তাদের হত্যার মধ্যে সওয়াব রয়েছে।[14]

অতএব অজ্ঞতা, বিবেকবর্জিত প্রবল আবেগ এবং দীনের প্রতি অন্ধ মমতা ছাড়া আর কিছুই তাদের এ পথে নিক্ষেপ করেনি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি তা ইলম ও সুগভীর জ্ঞানের ভিত্তিতে না হয়, তবে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। খারিজীরা নিজ যুগের আলিমদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তারা সাহাবীদের মধ্যকার আলিমদের পরিত্যাগ করেছিল এবং তাঁদেরকেই কাফির সাব্যস্ত করেছিল। তারা নির্জন স্থানে একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে নিজেদের পথভ্রষ্টতার চর্চা করতে লাগল। তারা নিজেদের অপরিণত বুঝের উপর নির্ভর করল এবং আলিমদের বাদ দিয়ে দিল। ফলে তাদের উপর যা আপতিত হওয়ার ছিল তা আপতিত হলো। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং তাদেরকে হত্যা করতে ও তাদের অনিষ্ট থেকে মুসলিমদের রেহাই দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের এত ইবাদত, আল্লাহর প্রতি এত ভয় এবং কুরআন তিলাওয়াত সত্ত্বেও যদি তা দ্বীনের সঠিক বুঝ ও প্রজ্ঞা

---

[14] বুখারী: ৬৪১৯, ওয়া মুসলিম: ১৭৬৪

ছাড়া হয় এবং তার সাথে আলিম ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের থেকে দূরে সরে থাকার প্রবণতা যুক্ত হয়, তাহলে তা তার অনুসারীদের এই ভয়াবহ পরিণতির দিকেই টেনে নিয়ে যায়। ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তাদের অর্থাৎ খারিজীদের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

وَلَهُمْ نُصُوصٌ قَصَّرُوا فِي فَهْمِهَا

فَأُتُوا مِنَ التَّقْصِيرِ فِي العِرْفَانِ

তাদের কাছে কিছু নুসুস ছিল, যার অর্থ বুঝতে তারা ব্যর্থ হলো।

যা তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার দরুণ হলো।

তাদের কাছে কিতাব ও সুন্নাহর কিছু দলিল রয়েছে কিন্তু তারা সেগুলো উদ্দেশ্য বহির্ভূতভাবে বুঝেছে। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উদ্দেশ্যে বাণী দিয়েছেন তার বিপরীত বুঝেছে। তাদের এ ভুলের কারণ ছিল অজ্ঞতা এবং আহলে ইলম, আহলে বাসীরাহ ও জ্ঞানে সুগভীর আলিমদের নিকট প্রত্যাবর্তন না করা। ফলে তাদের পরিণতি যা হওয়ার তাই হয়েছে। আর প্রতিটি যুগেই এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে যারা এই ভয়াবহ মতবাদকে গ্রহণ করে। শরয়ী বিধান হলো, যে ব্যক্তি দুই কালেমা উচ্চারণ করবে এবং প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করবে, আমরা তার প্রকাশ্য অবস্থা গ্রহণ করব এবং তার গোপন বিষয় আল্লাহর

উপর সোপর্দ করব। যতক্ষণ না তার থেকে এমন কোনো কাজ প্রকাশ পায় যা তার কুফর এবং ইসলাম দ্বীন থেকে তার রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগকে সাব্যস্ত করে, ততক্ষণ আমরা তার সাথে মুসলিমের ন্যায় আচরণ করব।

« أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। যখন তারা এগুলো করবে তখন তারা আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নিল, ইসলামের হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।[15]

[15] বুখারী: ৩৭২, ওয়া মুসলিম: ২৯

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبۡلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَتَبَيَّنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ﴾

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেছেন: হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা আল্লাহর পথে সফর করবে তখন যাচাই করে নেবে। আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেয় তাকে বলো না তুমি মুমিন নও। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহর নিকট প্রচুর গনীমতের সম্পদ রয়েছে। ইতোপূর্বে তোমরাও তো এমনই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা যাচাই করে নেবে। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত।[16]

কোনো এক যুদ্ধাভিযানে উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি এক কাফিরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার পিছু নিলেন এবং তাকে হত্যার জন্য দ্রুতগতিতে তার সন্ধানে ধাবিত হলেন। যখন তারা তাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলেন, তখন সে বলে উঠল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আনসারী ব্যক্তিটি তার থেকে বিরত থাকলেন, কিন্তু উসামা ইবনে যায়েদ তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করে ফেললেন। তার ধারণা ছিল যে সে হত্যার হাত থেকে

---

[16] সূরা আন-নিসা: ৯৪

বাঁচার জন্যই কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে, মনের বিশ্বাসে বলেনি। যখন এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছল, তখন তিনি উসামার প্রতি অত্যন্ত কঠোরভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং তাঁকে বললেন:

« أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا لِيَتَّقَى بِهَا السَّيْفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلَّا شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ مَاذَا تَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ!»

তুমি কি তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করেছ? উসামা বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে তো কেবল তরবারির আঘাত থেকে বাঁচার জন্যই এ কথা বলেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছ? তুমি কি তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করেছ? কিয়ামতের দিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমার সামনে উপস্থিত হবে তখন তুমি কী জবাব দেবে?[17]

তখন উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে তিনি ভুল করেছেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া ওয়াজিব এবং কোনো ব্যক্তি

---

[17] বুখারী: ৩৯৩৫, মুসলিম: ১৪১, আবু দাউদ: ৩৯০৪

সম্পর্কে মূলনীতি হলো সে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে সে ইসলামের স্বীকৃত কোনো ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে। আর তন্মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার সাথে শির্ক করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। এছাড়াও আরো অনেক ভঙ্গকারী বিষয় রয়েছে যা আহলে ইলমগণ উল্লেখ করেছেন। শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ সেগুলোর মধ্য থেকে দশটি প্রধান ভঙ্গকারী বিষয় সংকলন করেছেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে। যদি কেউ ইসলামের কোনো ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয় এবং সে শরীয়তসম্মত ওজরের আওতাভুক্ত না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগের হুকুম দেওয়া হবে। আর এই হুকুম দেওয়ার এখতিয়ার রাখেন কেবল তারাই যারা রব্বানী আলিম ও ইলমে রাসিখ তথা জ্ঞানে সুগভীর। মানুষের বিরুদ্ধে কুফরের ফায়সালা দেওয়ার দায়িত্ব ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারী, নবীন শিক্ষার্থী, মূর্খ ব্যক্তি অথবা বিবেকহীন ও চিন্তাহীন ইবাদতগুজার ব্যক্তিরা কখনোই পালন করতে পারে না।

এটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয় এবং এর ফায়সালা আল্লাহর দ্বীনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন আলিমদের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। যখন কারো থেকে ইসলামের কোনো ভঙ্গকারী বিষয় সংঘটিত হয়, তখন তার কাছে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হবে এবং তাকে তওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে। তার বিরুদ্ধে হুকুম প্রদানে তাড়াহুড়ো করা যাবে না। কেননা তার এমন কোনো ওজর থাকতে পারে যা তাকে কাফির গণ্য করা থেকে বিরত রাখে।

তাকফীর বা কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা থেকে বিরত রাখার কারণসমূহ

প্রথমত: জাহল (অজ্ঞতা)

তা হলো মানুষ এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকে যে এই কাজটি ইসলামের কোনো ভঙ্গকারী বিষয়। তাই তার কাছে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত: কখনো সে এই ভঙ্গকারী কাজটি বাধ্য হয়ে করে থাকতে পারে, নিজের ইচ্ছায় নয়।

আর বাধ্য ব্যক্তি মা'যুর তথা অপরাগ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেছেন:

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَانِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَٰفِرِينَ ۝ أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْغَٰفِلُونَ ﴾

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহতে কুফর করে, তবে যে ব্যক্তি বাধ্য হয় অথচ তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে সে ব্যতীত। কিন্তু

যে ব্যক্তি কুফরের জন্য বক্ষ প্রশস্ত করে দেয় তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ আপতিত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। এটা এ কারণে যে তারা আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং এ কারণে যে আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। এরাই তারা যাদের অন্তর, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই হলো গাফিল।[18]

এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হলো, মুশরিকরা আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধরে নির্মম নির্যাতন করে এবং যতক্ষণ না তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কটূক্তি করেন ততক্ষণ তারা তাঁকে ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তিনি তাদের কথামতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে আপত্তিকর মন্তব্য করেন, যেন তিনি এই বলপ্রয়োগের অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পান। অথচ তাঁর অন্তর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ও অবিচল ছিল। তিনি কেবল তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই, বলপ্রয়োগ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছিলেন। এরপর তিনি অনুতপ্ত

---

[18] সূরা আন-নাহল: ১০৬-১০৮

হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন:

«كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ قَالَ: مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ، قَالَ: إِنْ عَادُوا فَعُدْ»

তোমার অন্তর কেমন পেয়েছ? তিনি বললেন: ঈমানে পরিপূর্ণ ও অবিচল। তিনি বললেন: যদি তারা আবারো নির্যাতন করে তাহলে তুমি আবারো বলে দিও।[19]

তখন আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা এই আয়াত নাযিল করেন:

﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾

তবে যে ব্যক্তি বাধ্য হয় অথচ তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে সে ব্যতীত।

কাজেই বাধ্য ব্যক্তি অপরাধ করতে অপরাগ বা মা'যুর। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

﴿ لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾

---

[19] বাইহাকী: ১৬৮৯৬, কিতাবুল মুরতাদ, বাবুল মুকরাহি আলার রিদ্দাহ। আরো দেখুন: তাফসীর ইবনে কাসীর ওয়া তাফসীর ইবনে জারীর আত-তাবারী, সূরাতুন নাহল, আল-আয়াহ: ১০৬

মুমিনগণ যেন মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো আশঙ্কা করো অর্থাৎ আত্মরক্ষার তাকওয়া অবলম্বন করো, তা স্বতন্ত্র কথা।[20] আর তা হলো কেবল বলপ্রয়োগ প্রতিহত করা। সুতরাং বলপ্রয়োগের শিকার ব্যক্তির জন্য বলপ্রয়োগ থেকে মুক্তি পেতে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করা জায়েয এই শর্তে যে তার অন্তর ঈমানে অবিচল থাকবে, যেমনটি আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

তৃতীয়ত: সে মুতাআউয়িল বা ভুল ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল হতে পারে, ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি।

কিন্তু সে কোনো আয়াত বা হাদীস থেকে ভুল বুঝ নিয়ে এই ভ্রান্ত কথা বলেছে, যা সে তার ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বলেছে। এমতাবস্থায় তাকে বোঝানো হবে যে সে ভুল করেছে এবং তার বুঝ সঠিক নয়। যদি সে প্রত্যাবর্তন করে তবে তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে কয়েকজন ব্যক্তি মদ পান করেছিল, অথচ আল্লাহ তাআলা মদ সম্পর্কে বলেছেন:

---

[20] সূরা আলে ইমরান: ২৮

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾

হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর এগুলো ঘৃণিত বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাকো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। শয়তান তো কেবল মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে ও সালাত থেকে বিরত রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো এবং সাবধান হও। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখো, আমাদের রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।[21]

অতঃপর তিনি বলেছেন:

---

[21] সূরা আল-মায়িদাহ: ৯০-৯২

﴿ لَيۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٞ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحۡسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা খেয়েছে তার জন্য তাদের কোনো অপরাধ নেই, যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে। তারপর তাকওয়া অবলম্বন করবে ও ঈমান আনবে। তারপর তাকওয়া অবলম্বন করবে ও ইহসান করবে। আর আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন।[22] আয়াতটি সেই সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা মদ হারাম হওয়ার পূর্বে তা পান করত এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। যখন মদ হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন তাদের আত্মীয়রা তাদের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বলল: আমাদের বংশের লোকেরা তো মদ পান করত। ফলে তারা তাদের বিষয়ে আশঙ্কিত হলো। তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন:

[22] সূরা আল-মায়িদাহ: ৯৩

﴿ لَيۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٞ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحۡسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা খেয়েছে তার জন্য তাদের কোনো অপরাধ নেই, যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে। তারপর তাকওয়া অবলম্বন করবে ও ঈমান আনবে। তারপর তাকওয়া অবলম্বন করবে ও ইহসান করবে। আর আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালোবাসেন।[23]

অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাদের ওজর গ্রহণ করলেন। কেননা তারা মদ পান করেছিল তা হারাম হওয়ার পূর্বে। সুতরাং তারা এ বিষয়ে ওজরগ্রস্থ। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে সেই কয়েকজন ব্যক্তি মদ পান করল এবং বলল: আমরা তো ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, সুতরাং আমাদের জন্য তা পান করায় কোনো অসুবিধা নেই। তারা এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে মদ পান করেছিল। তারা ধারণা করেছিল যে ঈমানদার, মুত্তাকী ও ইহসানকারী

---

[23] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৯৩

ব্যক্তির জন্য তা পান করায় কোনো অসুবিধা নেই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে নিয়ে আসলেন এবং তাদের ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরা বললেন: যদি তারা একে হালাল মনে করে তবে তারা কাফির হয়ে যাবে, আর যদি হালাল মনে না করে তবে তাদের উপর বেত্রাঘাতের হদ জারি করা হবে। যখন তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো তখন তারা ব্যাখ্যা দিল যে তারা আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং এর সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারেনি। তখন তাঁরা ভুল ব্যাখ্যার কারণে তাদের ওজর গ্রহণ করলেন এবং তাদের কাফির বললেন না। তবে তাদের উপর মদ্যপানের হদ কায়েম করলেন। কেননা তারা মুসলিম, আর মুসলিম ব্যক্তি মদ পান করলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং তার উপর হদ জারি করা হবে। এটাই প্রমাণ করে যে ভুল ব্যাখ্যাকারীকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হবে। যদি সে স্বীকার করে, মেনে নেয় এবং ফিরে আসে তবে তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং তাকে কাফির বলা হবে না।

চতুর্থত: যে ব্যক্তি ইমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের কোনো একটি সংঘটন করে সে অন্যের অন্ধ অনুসরণকারী হয়ে থাকতে পারে, এ ধারণা থেকে যে অমুক অমুক ব্যক্তি বা অমুক দেশের লোকেরা এই কাজটি করে।

এটাই প্রমাণ করে যে এই কাজটি কুফর নয়। ফলে সে তাদের অন্ধ অনুসরণ করেছে অথচ তার নিকট সত্য ব্যাখ্যা করার মতো কেউ নেই। এমন ব্যক্তিকে বুঝিয়ে বলা হবে যে এই অন্ধ অনুসরণ জায়েয নয় এবং তারা ভুলের উপর রয়েছে। আর ভুলকারী ও বিরোধী ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করা জায়েয নয়। যখন তাকে বুঝিয়ে বলা হবে এবং সে ফিরে আসবে তখন তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে।

এগুলো হলো সেই ওজরসমূহ যার কারণে ইসলামের কোনো ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত ব্যক্তি ওজরগ্রস্থ গণ্য হবে এবং ওজরের বিবেচনায় তার থেকে রিদ্দাহর হুকুম রহিত হবে। কিন্তু কে এই দায়িত্ব পালন করবে?

যারা এই দায়িত্ব পালন করবেন তারা হলেন আলিমগণ। কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি এই দায়িত্ব পালন করবে না, যদিও সে হাদীস মুখস্থ রাখে এবং সেগুলো সঠিকভাবে বুঝে থাকে। এটি এমন ফিকহ বা গভীর জ্ঞান যা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন:

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন। আর যাকে হিকমত দান করা হয়, তাকে তো বিপুল কল্যাণ দান করা হলো।[24] হিকমত হলো আল্লাহর দ্বীনের ফিকহ বা গভীর জ্ঞান। অধিক পরিমাণে মতন মুখস্থ

---

[24] সূরা আল বাকারা আয়াত ২৬৯

করা এবং আয়াত ও হাদীস মুখস্থ করাই জ্ঞান নয়। জ্ঞান হলো আল্লাহর দ্বীনের ফিকহ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী চেয়েছেন তা জানা। কাজেই ফকীহগণই এ বিষয়ে অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষ, সুতরাং তাদের নিকটেই ফিরে যাওয়া ওয়াজিব।

তাকফীরের ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণি

বর্তমানে তাকফীরের ক্ষেত্রে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত: দুইটি প্রান্তিক ও একটি মধ্যমপন্থী দল।

প্রথম প্রান্তিক দল: অতিরঞ্জনকারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও কঠোরতাবলম্বী ব্যক্তিরা, যারা পূর্ববর্তী খারিজীদের পথ অনুসরণ করেছে এবং মুসলিমদের কাফির বলতে শুরু করেছে এবং তাদের ভুল বুঝের ভিত্তিতে তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল মনে করছে। এটি তাকফীরের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও অতিরঞ্জন, যা কোনো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ও আহলে ইলমের নিকট প্রত্যাবর্তন ছাড়াই করা হয়। যেমন পূর্বে খারিজীরা সাহাবীদের মধ্যকার আলিমদের নিকট প্রত্যাবর্তন না করার কারণে তাদের উপর পথভ্রষ্টতা ও ফিতনা আপতিত হয়েছিল। এগুলো হলো আলিমদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার, যোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে ইলম না নিয়ে অযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে ইলম গ্রহণের ক্ষতিকর

পরিণতি ও প্রভাব। এই সীমালঙ্ঘন, এই কঠোরতা ও এই অনিষ্টের ক্ষতি কেবল তার অনুসারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা মুসলিমদের পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

খারিজীরাই জামাতকে বিভক্ত করে এবং মুসলিমদের কাফির বলেও থাকে। তারা শির্ক ব্যতীত অন্যান্য কবীরা গুনাহের কারণেও মুসলিমদের কাফির বলে। তারা মদ পান করার কারণে কাফির বলে, সুদ খাওয়ার কারণে কাফির বলে, ব্যভিচার ও চুরির কারণে কাফির বলে। তারা এসব বিষয়ের কারণে কাফির বলে অথচ এগুলো কুফরের স্তরে পৌঁছে না। বরং এগুলো কবীরা গুনাহ, যার কারণে অপরাধীকে ফাসিক ও ঈমানে ত্রুটিযুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তার উপর হদ জারি করা হয় যদি হদ নির্ধারিত থাকে, যেমন চুরির হদ, মদ পানের হদ এবং ব্যভিচারের হদ। তার উপর হদ জারি করা হয় এবং প্রাণের বিনিময়ে প্রাণের কিসাসও জারি করা হয়, অথচ সে মুসলিম। যদি সে মুসলিম না হতো তবে তার উপর হদ জারি করা হতো না। মুরতাদের উপর হদ জারি করা হয় না, কারণ মুরতাদকে তার কুফরের জন্য হত্যা করা হয়। হদ তো কেবল মুসলিমদের মধ্য থেকে অবাধ্যদের উপর জারি করা হয়। কাজেই শির্ক ব্যতীত অন্যান্য কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের কাফির বলা হবে না। এটি তো কেবল খারিজীদের কাজ, যারা শির্ক ব্যতীত কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির উপর কুফরের

হুকুম আরোপ করে। এ কারণেই তারা মুসলিমদের রক্ত হালাল মনে করেছিল এবং মুসলিমদের হত্যা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কাফিরদের হত্যা করত না

«يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ»

যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেছেন: তারা ঈমানদারদের হত্যা করে এবং মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দেয়।[25]

খারিজীরা কখনো কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে বলে জানা যায় না। বরং খারিজীরা সর্বদা মুসলিমদের গর্দানের উপর আঘাত হানে। তারা প্রতিটি যুগেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাদের হত্যা করে। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এরাই হলো খারিজী, যারা আনুগত্যের লাঠি ভেঙে ফেলে, জামাতকে বিভক্ত করে, মুসলিমদের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং মুসলিমদের রক্ত হালাল মনে করে। কারণ তারা শির্ক ব্যতীত কিছু কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে মুসলিমদের উপর কুফরের হুকুম আরোপ করে। এটা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা এবং তারা

---

[25] বুখারী: ৩০৯৫, মুসলিম: ১৪৯৮, নাসায়ী: ২৫৩১, মুসনাদে আহমাদ: ১৮৫৪

যেসব দলিল গ্রহণ করেছে সেগুলোর ব্যাখ্যা ও বর্ণনার জন্য তারা অন্য দলিলের নিকট প্রত্যাবর্তন করেনি। কেননা আল্লাহর কিতাবে মুহকাম ও মুতাশাবিহ রয়েছে।

﴿ هُوَ الَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾

আল্লাহ তাআলা বলেছেন: তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত মুহকাম, সেগুলোই কিতাবের মূল ভিত্তি। আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ। সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তার অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহের অনুসরণ করে।[26]

তারা মুতাশাবিহ গ্রহণ করে এবং মুহকাম বাদ দেয় যা তার ব্যাখ্যা করে, তাকে সুস্পষ্ট করে এবং বর্ণনা করে। তারা নসসমূহের একাংশ গ্রহণ করে এবং অপরাংশ বাদ দেয়।

পক্ষান্তরে জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তিরা, যারা মধ্যপন্থী, তারা বলেন:

﴿ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾

---

[26] সূরা আলে ইমরান: ৭

আমরা এর উপর ঈমান এনেছি, সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। আমরা মুহকাম ও মুতাশাবিহের উপর ঈমান এনেছি, কারণ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। তারা মুতাশাবিহকে মুহকামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করে। কুরআন মাজীদে ওয়াদীদ বা সতর্কবাণীর আয়াতগুলোর বিপরীতে ওয়াদ বা আশাবাণীর আয়াত রয়েছে, ক্ষমা ও তাওবার আয়াত রয়েছে এবং সেসব সীমা লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান সংক্রান্ত আয়াত রয়েছে যা কবীরা গুনাহ হলেও শির্ক পর্যায়ভুক্ত নয়। একটিকে অপরটির বিপরীতে রাখা হয়, একটির দ্বারা অপরটির ব্যাখ্যা করা হয় এবং একাংশ গ্রহণ করে অপরাংশ বাদ দেওয়া হয় না।

এটাই হলো তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রথম প্রান্তিক দল। তারা হলো খারিজী এবং যারা মুসলিমদের কাফির বলার ক্ষেত্রে, শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে, আনুগত্যের লাঠি ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে এবং মুসলিমদের জামাতকে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের পথ অনুসরণ করে। আল্লাহ তাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করুন এবং তাদের বিপদ থেকে আমাদের নিরাপদ রাখুন। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি তাদের হিদায়াত দান করেন এবং তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। তবে এ বিষয়টি মুসলিমদের খারিজীদের ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং তাদের থেকে সাবধান থাকার শিক্ষা দেয়।

আর যেন তারা তাদের উপর আস্থা না রাখে এবং নিজেদের সন্তানদের তাদের জন্য শিকার হিসেবে ছেড়ে না দেয়, যারা তাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদেরকে সেই সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণায় পরিপূর্ণ করে দেয় যার দ্বারা পূর্ববর্তীরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। সুতরাং এটি মুসলিমদের খারিজীদের ব্যাপারে একটি শিক্ষা প্রদান করে।

তারা কখনো বিলুপ্ত হয়নি, বরং প্রতিটি যুগেই তারা আবির্ভূত হয়। এই চিন্তাধারা টিকে আছে, পথভ্রষ্টরা তা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো তাদের থেকে সাবধান থাকা এবং অন্যদের তাদের থেকে সতর্ক করা, নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের সংযত রাখা এবং বিশুদ্ধ আকীদার গ্রন্থসমূহ পাঠের প্রতি যত্নবান হওয়া যেগুলোতে এই বিচ্যুত ও বিপথগামী দলগুলোর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী রয়েছে। আলিমগণ এ ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করেননি, তাঁরা আকীদার গ্রন্থসমূহে এ বিষয় উল্লেখ করেছেন যা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলেজ, মাদরাসা ও মসজিদে পাঠদান করা হয়, যাতে মুসলিমরা আল্লাহর দ্বীনে সুগভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং এই মন্দ চিন্তাধারা থেকে সাবধান থাকতে পারে, যা পথভ্রষ্টরা বহন করে এবং তাদের পেছনে রয়েছে কাফিররা যারা তাদের সমর্থন যোগায়, এগিয়ে দেয় ও উৎসাহিত করে, যেন তাদের দ্বারা মুসলিমদের আঘাত করতে পারে। অতএব আমাদের এই শ্রেণির মানুষ থেকে সাবধান থাকা

কর্তব্য। এরা বিদ্যমান, বারবার আবির্ভূত হয় এবং প্রতিটি সময়ে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং আমাদের এই চিন্তাধারা ও এর ধারকদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

দ্বিতীয় প্রান্তিক দল: শিথিলতাবলম্বী দল। যারা মনে করে যে কাউকেই কাফির বলা যাবে না এবং যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে সে মুসলিম, সে যত কিছুই করুক না কেন। যদি সে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করে, যদি সে যে কোনো কাজই করে, তারা বলে: তাকে কাফির বলা যাবে না, যেহেতু সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। সুবহানাল্লাহ! যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, সে যদি ঈমান ভঙ্গকারী কাজসমূহ সম্পাদন করে তবে সে কাফির হবে না? 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর দাবি অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য। সে যেন এর অর্থ জানে এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল করে। যদি সে মুখে তা উচ্চারণ করে কিন্তু তার কর্ম, বিশ্বাস ও চিন্তাধারা দ্বারা তার বিপরীত করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে, যদিও সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। কারণ সে তার আকীদা, কথা ও কাজের মাধ্যমে সেই কালিমার বিপরীত কাজ করে ফেলে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উল্লেখ করলেন যে:

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مَالَهُ وَدَمه، قَالَ : إِلَّا بِحَقِّهَا

‘যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তার সম্পদ ও রক্ত হারাম’, তখন তিনি বললেন, ‘ইল্লা বিহাক্কিহা’ অর্থাৎ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর হক বা প্রকৃত দাবি অনুযায়ী। আর তা হলো, সে এ কালিমার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে, সে অনুযায়ী আমল করবে এবং এর পরিপন্থী ও বিনাশকারী বহু আকীদা, কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। কাজেই যে কেউ কেবল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে বলে তাকে ইসলামের ওপর অবিচল থাকার বিচার দেওয়া হবে না, যতক্ষণ না সে এই বিনাশকারী বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকে ও দূরে সরে চলে। মুরজিয়াদের মধ্যে কতিপয় এমন লোক আছে যারা বলে থাকে, কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে বিশ্বাস রাখে এবং মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করে, ততক্ষণ তাকে কাফির বলা যাবে না। এমনকি যদি সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু যবেহ করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে এবং মৃত ও কবরবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, সে যাই করুক না কেন সে মুসলিমই থাকবে। এটি চরম অবহেলা ও শৈথিল্যের পরিচায়ক, আল্লাহর পানাহ চাই, এবং এটি শরীয়তের অকাট্য দলীলসমূহকে অগ্রাহ্য করার নামান্তর। যেমনিভাবে খারেজীরা নসসমূহের একাংশ গ্রহণ করেছিল, তেমনি এরাও নসসমূহের অপর একাংশ গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে উভয় দলই সমান, কেননা তারা সমস্ত নস একত্রে গ্রহণ করেনি এবং একটির

ব্যাখ্যা অপরটি দ্বারা প্রদান করেনি অথবা একটিকে অপরটির দিকে প্রত্যাবর্তন করায়নি।

আর এরাই হলো সেই মুরজিয়া সম্প্রদায়, যারা বলে থাকে যে:

لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ

ঈমানের সাথে পাপাচার থাকা ঈমানের কোনো ক্ষতি করে না,
যেমনিভাবে কুফরের সাথে আনুগত্য কোনো উপকারে আসে না।[27]

---

[27] মুরজিয়াহদের এই মূলনীতিটি দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথম অংশে তারা বলে, ঈমানের সাথে কোনো গুনাহ ক্ষতি করে না। দ্বিতীয় অংশে তারা বলে, কুফরের সাথে কোনো নেকী উপকার করে না।
দ্বিতীয় অংশটির মর্ম হলো, কোনো ব্যক্তি যদি কাফের হয় অর্থাৎ তার অন্তরে ঈমান না থাকে, তাহলে সে দুনিয়াতে যত ভালো কাজই করুক, দান-সদকা করুক, মানুষের উপকার করুক, ন্যায়বিচার করুক না কেন আখিরাতে এসব কিছুই তার কোনো কাজে আসবে না। কুফরের কারণে তার সমস্ত সৎকর্ম বরবাদ হয়ে যাবে।
মুরজিয়াহ এই দ্বিতীয় অংশটিকে প্রথম অংশের পক্ষে দলীল হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাদের যুক্তি হলো, তোমরা যেমন স্বীকার করো যে কাফেরের ভালো কাজ তাকে বাঁচাতে পারে না কারণ তার ঈমান নেই, ঠিক তেমনি তোমাদের মানা উচিত যে মুমিনের গুনাহও তাকে ক্ষতি করতে পারে না কারণ তার ঈমান আছে। অর্থাৎ ঈমান থাকলে গুনাহ যেমন অক্ষতিকর, কুফর থাকলে নেকীও তেমনি অকার্যকর।
আহলুস সুন্নাহ এই কিয়াসকে বাতিল বলেছেন। দ্বিতীয় কথাটি সঠিক হলেও প্রথম কথাটি কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিরোধী। কুরআন ও হাদীসে বারবার

গুনাহকারী মুমিনদের জন্য শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে গুনাহ মুমিনের ঈমানের ক্ষতি করে এবং তাকে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন করতে পারে। - অনুবাদক এর পক্ষ থেকে ব্যাখা

এই কথাটির ব্যাখা পাঠকদের কাছে আরো স্পষ্ট করতে শায়েখ মুহাম্মদ বিন সলেহ আল উছাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) এর ব্যাখা এখানে যুক্ত করে দিচ্ছি – অনুবাদক। শারহু আক্বীদাতিস সাফারিন্যিয়াহ গ্রন্থে ৫০৯-৫১০ পৃষ্ঠায় শায়েখ রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ وهناك طائفة ثالثة من المبتدعة ؛ وهم المرجئة الذين يقولون : إن أهل الكبائر لا يدخلون النار، لأنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة . فهم يقولون إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، فإذا أمن الإنسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العقاب، وإذا قيل لهم : فما تقولون في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد ؟ قالوا : هذه في الكفار ، أما المؤمن فلا يمكن أن يدخل النار. وهذا المذهب باطل ؛ لأن هناك نصوصاً كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر ، فقطع الرحم مثلاً ليس بكفر ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «لا يدخل الجنة قاطع

আর বিদআতীদের মধ্যে একটি তৃতীয় দলও রয়েছে; তারা হলো মুরজিয়া। তারা বলে যে কবীরা গুনাহের অধিকারী ব্যক্তিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। কেননা তাদের মতে, ঈমানের সাথে পাপাচার কোনো ক্ষতি করে না, যেমনিভাবে কুফরের সাথে আনুগত্য কোনো উপকারে আসে না। সুতরাং তারা বলে যে আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। যখন কোনো ব্যক্তি অন্তরে ঈমান আনয়ন করে, তখনই সে মুমিন হয়ে যায় এবং সে শাস্তির যোগ্য হয় না। যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী আয়াতসমূহ ও শাস্তি বিষয়ক হাদীস সম্পর্কে কী মত পোষণ করো? তখন তারা উত্তরে বলে, এ সকল দলীল প্রমাণ কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মুমিন ব্যক্তি কখনোই জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে না। আর এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ এমন অসংখ্য সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যেখানে এমন কর্মকাণ্ডের উপর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যা...

এটাই তাদের মূলনীতি ও মতবাদ। তারা বলে, ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, যদিও সে মুখে উচ্চারণ নাও করে। আর তাদের কেউ কেউ বলে, ঈমান হলো মুখের উচ্চারণ, যদিও সে অন্তরে বিশ্বাস নাও রাখে। আবার তাদের কেউ কেউ বলে, ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস রাখা ও মুখে স্বীকার করা, যদিও সে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কোনো আমল নাও করে। তাদের সকলের মতেই আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর তাদের কেউ কেউ বলে, আমল ঈমানের জন্য শর্ত, ঈমানের অঙ্গ নয়। বরং তা একটি পরিপূরক শর্ত। তাদের এই দলকেই মুরজিয়া নামে অভিহিত করা হয়। এ সকল কথাই পথভ্রষ্ট মুরজিয়া মতবাদের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি অবহেলা ও শৈথিল্যের চরম রূপ। সুতরাং এরা খারেজীদের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে অবস্থান করছে এবং বর্তমানেও তাদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। আর তাদের চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট হলো বর্তমান যুগের কিছু মূর্খ সাংবাদিক ও লেখক সম্প্রদায়, যারা এই মুরজিয়া মতবাদটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা এখন প্রকাশ্যে এই আহ্বান জানাতে শুরু করেছে যে, কাউকেই কাফির বলা যাবে না, কারো বিরুদ্ধেই ধর্মত্যাগের হুকুম লাগানো যাবে না এবং

...মূলত কুফরী নয়। উদাহরণস্বরূপ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কুফরী নয়, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "জান্নাতে প্রবেশ করবে না আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী।"(সহীহ বুখারী ৫৯৮৪)

শুধুমাত্র নিজেকে ইসলামের নামে অভিহিত করাটাই যথেষ্ট, যদিও ওই ব্যক্তি ইসলাম পরিপন্থী এবং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক যা কিছু করার তাই করে। তারা বলে থাকে যে তার উপর কুফরের হুকুম দেওয়া যাবে না। এটা সুস্পষ্ট অবহেলা ও প্রকৃষ্ট গোমরাহী। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ

তৃতীয় দল: মধ্যপন্থী দল। আর তারাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত। যারা নিজেদের খারিজীদের মতবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে এবং মুরজিয়াহদের মতবাদ থেকেও মুক্ত ঘোষণা করেছে এবং যারা তাদের পথ অনুসরণ করেছে তাদের থেকেও মুক্ত।

তারা এই বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন এবং বলেছেন:
যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো একটি ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয় এবং পূর্বে উল্লেখিত ওজরসমূহের মধ্য থেকে তার নিকট কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর বিদ্যমান না থাকে, তবে তার উপর ধর্মত্যাগের হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদিও সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং হজ করে, কিন্তু যেহেতু তার অন্তরে বাতিল আকীদা বিদ্যমান রয়েছে অথবা সে এমন কুফরী কর্ম সম্পাদন করেছে এবং তার কাছে সেই সকল ওযরের কিছুই নেই যা তার থেকে কুফরের হুকুম রহিত করে দিতে পারে, সেহেতু তার কুফরী ও ধর্মত্যাগের হুকুম দেওয়া হবে। আর এটাই হলো সমস্ত দলীল প্রমাণের মধ্যকার

সমন্বয় বিধান। ওয়াদ বা পুণ্যের পুরষ্কার বিষয়ক দলীলসমূহ ও ওয়াদীদ বা সতর্কবাণী বিষয়ক দলীলসমূহের মধ্যে সমন্বয়; যেসব নস খারিজীরা ধারণ করেছিল এবং যেসব নস মুরজিয়াহরা ধারণ করেছিল সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন।

আহলুস সুন্নাহ বলেন: যে ব্যক্তি ইমান ভঙ্গকারী কোনো বিষয়ে লিপ্ত হয় এবং তার কোনো ওজর না থাকে, তার নিকট বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হবে এবং সুস্পষ্ট করে বোঝানো হবে। যদি সে একগুঁয়েমি করে এবং নির্দেশনা গ্রহণ না করে, তাহলে তার উপর রিদ্দাহর হুকুম দেওয়া হবে, মুরজিয়াহদের বিপরীতে। যদিও সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং যদিও সে সিয়াম পালন করে ও সালাত আদায় করে। কেননা সে তার কর্ম, বিশ্বাস ও বক্তব্যের মাধ্যমে তা ভঙ্গ করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইমান ভঙ্গকারী কোনো বিষয়ে লিপ্ত হয়নি কিন্তু শির্কের নিম্নস্তরের কবীরা গুনাহসমূহের কোনো একটিতে লিপ্ত হয়েছে, যেমন ব্যভিচার, চুরি, মদ পান, সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ এবং অন্যান্য কবীরা গুনাহ, তাকে পূর্ণ ঈমানদার বলা হবে না যেমন মুরজিয়াহ বলে, এবং তাকে খাঁটি কাফিরও বলা হবে না যেমন খারিজীরা বলে।

বরং বলা হবে: সে তার ঈমানের কারণে মুমিন এবং তার গুনাহের কারণে ফাসিক। তারা তাকে ঈমানে ত্রুটিপূর্ণ মুমিন নামে অভিহিত

করে। তারা তাকে মুতলাকুল ঈমান তথা সার্বিক ঈমানের অধিকারী বলে স্বীকার করে কিন্তু তাকে আল-ঈমানুল মুতলাক তথা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী বলে স্বীকার করে না। পূর্ণাঙ্গ ঈমান হলো পরিপূর্ণ ঈমান। আর মুতলাকুল ঈমান হলো ত্রুটিপূর্ণ ঈমান, যার অধিকারী কুফরের স্তরে পৌঁছেনি। সুতরাং তার উপর ফিসক বা পাপাচারের হুকুম দেওয়া হবে এবং সে ঈমানে ত্রুটিপূর্ণ বলে গণ্য হবে। কিন্তু তারা তার উপর রিদ্দাহর হুকুম দেয় না, যেমন খারিজীরা বলে থাকে। আবার তারা তার জন্য পূর্ণ ঈমানের ফায়সালাও দেয় না, যেমন মুরজিয়াহ বলে থাকে। তারা বলে: ঈমান হলো মুখের উচ্চারণ, অন্তরের বিশ্বাস এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। তা আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহের মাধ্যমে হ্রাস পায়।

এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং এটি বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মধ্যবর্তী তাকফীরের মাসআলা। সুতরাং ওয়াজিব হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মানহাজকে আঁকড়ে ধরা। আর এটাই হলো সেই মধ্যমপন্থী মানহাজ যা কিতাব ও সুন্নাহ নিয়ে এসেছে। কিন্তু এই মানহাজ অর্জন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত আলেমগণের নিকট ইলম শিক্ষা করা হয়, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করা হয় এবং পথভ্রষ্ট লেখনী ও রচনাবলী থেকে দূরে অবস্থান করা হয়, যেগুলো রচনা করেছে পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা অথবা যেগুলো রচনা

করেছে মূর্খ ও অল্প জ্ঞানের অধিকারী হয়ে বড়ত্ব প্রদর্শনকারী লোকেরা। আমরা এ সকল কিছু থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকব এবং উপকারী ইলম ও নেক আমলের মাধ্যমসমূহ গ্রহণ করব। আল্লাহ সকলকেই সৎকথা ও সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক দান করুন।

আর ওয়াজিব হলো মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আলেমগণের তত্ত্বাবধানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মতবাদ ও আকীদা পাঠদান করানো, যাতে করে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে ভ্রান্ত ধারণাসমূহ থেকে রক্ষা করতে পারি। আর এ থেকেই প্রমাণিত হয় তাদের চিন্তাধারা কতটা ভ্রান্ত যারা বলে থাকে যে আকীদার কিতাবসমূহ পাঠ্যসূচী থেকে উঠিয়ে দিতে হবে, কারণ এগুলো নাকি সন্ত্রাসবাদ শিক্ষা দেয়। এ কথা সম্পূর্ণ বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর কিতাবসমূহ সন্ত্রাসবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এগুলো বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝখানের মধ্যমপন্থী মানহাজকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকে। যদি এসব কিতাব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে না পড়ানো হয়, তাহলে অচিরেই সেই অল্পজ্ঞানী ও অল্পবিদ্যা নিয়ে বড়ত্ব প্রদর্শনকারী ব্যক্তিরাই এসব পাঠদানের দায়িত্ব নেবে যারা এসব বিষয়ে পারদর্শী নয় এবং তারা বিশ্রামাগারে, সফরকালে ও লোকচক্ষুর আড়ালে গোপন স্থানে বসে এসব বিষয়ের শিক্ষা দিতে শুরু করবে, আর তাতেই ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে।

এখানেই বক্তব্য সমাপ্ত। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

প্রশ্নসমূহ

প্রশ্ন ১: সম্মানিত শাইখ, আপনি বলেছেন তাকফীরের প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো ইকরাহ বা বলপ্রয়োগ। প্রশ্ন হলো, ইকরাহ বা বলপ্রয়োগের সীমা কতটুকু, যা দ্বারা ব্যক্তি ওজরগ্রস্থ বলে গণ্য হবে?

উত্তর: ইকরাহ বা বলপ্রয়োগের সীমা হলো, কোনো ব্যক্তিকে হত্যা অথবা প্রহার অথবা তার ইজ্জত নষ্ট করার ভয় দেখানো হবে এবং তাদের দাবিকৃত বিষয় না দিয়ে সে অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে না। তখন সে বলপ্রয়োগ থেকে বাঁচার জন্য তাদের চাওয়া পূরণ করবে (কুফরি কথা বলবে), কিন্তু অন্তরে তা অস্বীকার করবে এবং তার অন্তর ঈমানে অবিচল ও পরিপূর্ণ থাকবে। এটাই হলো ইকরাহ বা বলপ্রয়োগ।

প্রশ্ন ২: কোনো আলিমের নিকট যখন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির কুফরী সুস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন কি তা থেকে মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে

বিষয়টি প্রকাশ করা জরুরি? আর এ ক্ষেত্রে মাসলাহাত বা কল্যাণের সীমা কী?

উত্তর: যদি এই ব্যক্তির রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগের হুকুম মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, মানুষ তার দ্বারা প্রতারিত হয় এবং সে তার মতবাদ প্রচারে লিপ্ত থাকে, তাহলে তার ব্যাপারে সতর্ক করা ওয়াজিব এবং চুপ থাকা যাবে না। পক্ষান্তরে যদি তার অনিষ্ট তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সে তার অনিষ্ট ছড়িয়ে না বেড়ায়, তাহলে তাকে উপদেশ দেওয়া হবে।

প্রশ্ন ৩: যারা বলে, খারিজীরা কেন জাহল বা অজ্ঞতা এবং তাবীল বা অপব্যাখ্যার ওজরে ওজরগ্রস্থ বলে গণ্য হবে না, যেমনিভাবে আমরা কোনো ইমান ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত ব্যক্তিকে আপনাদের উল্লেখিত ওজরসমূহের কারণে মা'যুর বা ওজরগ্রস্থ বলে গণ্য করেছি, এ ব্যাপারে আপনাদের উত্তর কী?

উত্তর: কারণ তারা তরবারি উন্মুক্ত করেছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে যদি তারা চুপ থাকত, নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, নিজেদের কুফরি বিশ্বাসেই সন্তুষ্ট থাকত এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করত, তাহলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হত। এ কারণেই যে ব্যক্তি খারিজী মতবাদ গ্রহণ করেছে কিন্তু তার থেকে কোনো কিছু

প্রকাশ পায়নি এবং সে যুদ্ধ করেনি, তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কারণ তার অনিষ্ট তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

প্রশ্ন ৪: কিছু দাঈ যারা বর্তমান সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও অন্যান্য স্থানে বক্তব্য প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন তাদের কারো কারো নিকট থেকে এ কথা শোনা যায় যে, সকল মুসলিম দেশের শাসকগণই জালিম এবং তাদেরকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। এ ব্যাপারে আপনারা (হাফিযাকুমুল্লাহ) কী বলবেন?

উত্তর: এতে হস্তক্ষেপ করা আমাদের কাজ নয়। শাসকদের পরিবর্তন করার যে প্রচেষ্টার ফলে রক্তপাত সংঘটিত হয়, নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়, মুসলিমদের জান-মালের ক্ষতি সাধিত হয় এবং যার ফলাফল অনিশ্চিত ও নিশ্চিত নয়, এমন কাজ করা বৈধ নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে তুলনা করা আবশ্যক। আর অকল্যাণ প্রতিহত করাকে কল্যাণ অর্জনের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন ৫: হে সম্মানিত শায়খ, যুবসমাজ বা অনেক যুবকের জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার পরিচালনার মাসআলা। অতএব আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন, আমরা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আশা করছি।

উত্তর: আলেমগণ এ বিষয়টি ইতোমধ্যে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এর সবচেয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ইবনে কাছীর রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্যে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিচার ফয়সালা করে, যদি সে বিশ্বাস করে যে তার এ বিচার আল্লাহর কিতাবের চেয়ে উত্তম, অথবা তার ফয়সালা আল্লাহর হুকুমের চেয়ে উত্তম, অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের হুকুম আল্লাহর হুকুমের সমতুল্য এবং সে এ বিষয়ে ইচ্ছাধীন যে ইচ্ছা করলে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা করতে পারে আর ইচ্ছা করলে অন্য কিছু দ্বারা ফয়সালা করতে পারে, তাহলে নিঃসন্দেহে তার কুফরীর হুকুম দেওয়া হবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির বলে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে যদি সে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে আল্লাহর হুকুমই সত্য এবং মানব রচিত আইন বাতিল, কিন্তু সে তার মনের কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অথবা কোনো প্রাপ্তির লোভে পড়ে সেই আইন দ্বারা বিচার করে, তাহলে সে জালিম ও ফাসিক বলে গণ্য হবে, কিন্তু তার উপর কুফরীর হুকুম প্রযোজ্য হবে না। কেননা সে বিশ্বাস করে যে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করাই ওয়াজিব এবং তা ব্যতীত অন্য সব বিধান বাতিল। কিন্তু সে এই কাজটি করেছে হয় চাকরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য কোনো লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে। অথচ

আল্লাহর কিতাবের প্রতি তার আকীদা অটুট রয়েছে যে একমাত্র কিতাবই সত্য এবং তার দ্বারাই বিচার ফয়সালা করা আবশ্যক। কাজেই এমতাবস্থায় সে ফাসিক হবে কিন্তু তাকে কাফির বলা হবে না। কেননা এটি হল আমলগত কুফরী, যেমনটি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, এটা হচ্ছে কুফরে দূনা কুফর বা বড় কুফরীর পর্যায়ভুক্ত নয় এমন কুফরী।

প্রশ্ন ৬: ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বিশেষ পোশাক পরিধান করার বিধান কী, যেমন ক্রুশ ঝুলানো এবং এর অনুরূপ?

উত্তর: ক্রুশ ঝুলানো জায়েয নয়। কারণ তা কুফরের প্রতীক। আর খ্রিস্টানদের বিশেষ পোশাক যা তাদের ইবাদত ও তাদের ধর্মীয় নিদর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাও পরিধান করা জায়েয নয়। কারণ তা তাদের দ্বীনের প্রতীক। পক্ষান্তরে তাদের সাধারণ পোশাক যা তারা অভ্যাসগতভাবে পরে, ইবাদতের জন্য নয় এবং তাদের গির্জার ধর্মীয় নিদর্শনের জন্যও নয়, যার সাথে তাদের দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং তা রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত, এর বিষয়টি সহজ ও প্রশস্ত । তবে তাতে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বনের সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই তা পরিত্যাগ করাই উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করলো, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[28] পক্ষান্তরে ক্রুশ ঝুলানো অথবা তাদের গির্জার বিশেষ পোশাক বা তাদের দ্বীনের প্রতীকসমূহ পরিধান করা মুসলিমের জন্য জায়েয নয়।

প্রশ্ন ৭: প্রশ্নকারী বলছেন, কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো কাজ করে যাকে আলেমগণ ইমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু সে ব্যক্তি নিজে স্বীকার করে যে এটি কবীরাহ গুনাহসমূহের মধ্যে একটি কবীরা গুনাহ এবং সে এ কাজে ভুল করেছে, তাহলে কি সে কাফির বলে গণ্য হবে?

উত্তর: এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি কাফির হবে না। পূর্বে যেমন আলোচিত হয়েছে যে, যদি সে কাজটি কোনো প্রকার ভুল ব্যাখ্যার বশবর্তী হয়ে করে, অথবা অজ্ঞতাবশত করে, অথবা বলপ্রয়োগের শিকার হয়ে করে, অথবা অন্ধভাবে অন্যের তাকলীদ বা অনুসরণ করে, তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না। তবে তার উপর ফাসিক হওয়ার হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং সে ঈমানে ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ৮: হে সম্মানিত শায়েখ (ওয়াফ'ফাকাল্লাহু), আমরা লক্ষ্য করি যে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেখানে বসবাস

---

[28] আবু দাউদ: ৪০৩১

করতে থাকে, তাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ করে নারীরা কিছু সময় পর আবার ইসলাম ত্যাগ করে ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। এই বিষয়ে আপনার মূল্যবান দিকনির্দেশনা কী?

জ্ঞাতব্য যে, এই প্রশ্নটি যিনি লিখেছেন তিনি নিজেও একজন পশ্চিমা দেশ থেকে আগত নওমুসলিম।

উত্তর: হ্যাঁ, মুসলিম ব্যক্তি সর্বদা বিপদের সম্মুখীন, সে পাশ্চাত্যের দেশে অবস্থান করুক অথবা প্রাচ্যের দেশে। মুসলিম ব্যক্তি সর্বাবস্থায় শত্রুদের পক্ষ থেকে এবং পথভ্রষ্ট প্রচারণাসমূহের পক্ষ থেকে ঝুঁকির মধ্যে থাকে। তাই তার উপর আবশ্যক হলো নিজ দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, নিজ দ্বীনের বিধি বিধান শিক্ষালাভ করা এবং ধৈর্য ধারণ করা। ধৈর্য ধারণ করা অপরিহার্য। কারণ সে কষ্ট, উৎপীড়ন, প্রলোভন ও কুপ্রবৃত্তির চাহিদার সম্মুখীন হতে পারে। দ্বীনের উপর অবিচল থাকার জন্য ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আর যার ধৈর্য নেই সে সংঘটিত ফিতনা ও অনিষ্টকর পরিস্থিতিতে দ্বীনের উপর টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে, অবশ্যই আল্লাহর দ্বীনের প্রজ্ঞা ও বুঝ অর্জন করতে হবে এবং অবশ্যই এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল থাকতে হবে। আর যদি সে মুসলিম দেশসমূহে হিজরত করতে সক্ষম হয়, তবে নিজ দ্বীন রক্ষার্থে পলায়নের নিয়তে হিজরত করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৯: আমাদের এখানে একটি জামাআতের আবির্ভাব ঘটেছে, মনে হয় প্রশ্নকারী এই দেশ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের অধিবাসী, যেখানে তারা বলে থাকে যে আমল ঈমানের শুদ্ধতার জন্য শর্ত, রুকন নয়। আর তারা আমাদেরকে তথা যারা কিনা বলে যে আমল ঈমানের রুকন, তাদেরকে তারা খারেজী বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তাদের এই উক্তির হুকুম কী?

উত্তর: যারা বলে যে আমল হচ্ছে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব পর্যায়ের পূর্ণতার জন্য শর্ত, এটি মূলত মুরজিয়াদের উক্তি। তারা মনে করে যে আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা ঈমানের বাইরের একটি বিষয়। অথচ সঠিক কথা এই যে, আমল ঈমানেরই অংশ, শুধু ঈমানের জন্য শর্ত নয়; বরং তা ঈমানেরই অংশ এবং ঈমানের বাস্তব সত্তার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আমল হারিয়েছে সে হয় ঈমানে ত্রুটিপূর্ণ, অথবা যদি সে সম্পূর্ণরূপে আমল পরিত্যাগ করে এবং কখনোই কোনো আমল না করে, কোনো প্রকার গ্রহণযোগ্য ওজর ব্যতীত, অথচ সে আমল করার সক্ষমতা রাখে, তাহলে তার মূলে কোনো ঈমানই নেই, সে মুমিন নয়। আর যে ব্যক্তি কিছু আমল পরিত্যাগ করে, তার বিষয়টি বিবেচনা সাপেক্ষ। হতে পারে সে ঈমানে ত্রুটিপূর্ণ, আবার এমনও হতে পারে যে তার ঈমান বলতে কিছুই নেই। যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে, আর নামায তো একটি আমল, সে ব্যক্তি হাদীসের

সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী কাফির হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

«إِنَّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكَ الصَّلَاةِ»

নিশ্চয়ই বান্দা এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায পরিত্যাগ করা।[29]

সুতরাং কিছু আমল এমন আছে যা পরিত্যাগ করলে মানুষ কাফির হয়ে যায়, আর কিছু আমল এমন আছে যা পরিত্যাগ করলে কখনো কাফির হতে পারে আবার কখনো নাও হতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ও গভীর যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। মূল কথা হলো, আমল ঈমানের বাস্তব সত্তার অন্তর্ভুক্ত, তা নিছক একটি বহির্ভূত শর্ত নয়। কারণ শর্ত সবসময় শর্তাধীন বস্তুর বাইরে অবস্থান করে, পক্ষান্তরে আমল ঈমানের বাইরের কোনো বস্তু নয়, বরং তা ঈমানের অভ্যন্তরেই বিদ্যমান। কিন্তু তাদের এ কথা তাদের দ্বীন সম্পর্কে অগভীর জ্ঞান ও আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে তাদের অনুধাবনের স্বল্পতারই বহিঃপ্রকাশ।

---

[29] সহীহ মুসলিম: ৮২

প্রশ্ন ১০: আমরা আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। আপনি তাদের সম্পর্কে কী বলেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত যেমন দাড়ি রাখা এবং কাপড় টাখনুর উপরে পরিধান করা এবং যারা এগুলো মেনে চলে তাদের নিয়ে উপহাস করে? আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

উত্তর: যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে নিয়ে উপহাস করে অথবা তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তার মধ্যে এক প্রকার রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগ বিদ্যমান, আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। সুন্নাতসমূহকে অপছন্দ করা ইসলামের ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴾

আল্লাহ তাআলা বলেছেন: এটা এজন্য যে তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অপছন্দ করেছে, ফলে তিনি তাদের আমলসমূহ বাতিল করে দিয়েছেন।[30] সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুন্নতকে অপছন্দ করে অথবা তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, সে অবশ্যই ইসলামের কোনো একটি ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

---

[30] সূরা মুহাম্মাদ: ৯

আর পরিধেয় বস্ত্র টাখনুর নিচে ঝুলবে না এবং পায়ের অর্ধ-গুলের[31] উপরে উঠবে না। এই মধ্যবর্তী স্থানে দেশের প্রচলিত রীতি অনুসরণ করা হবে। যদি দেশের পুরুষদের রীতি হয় যে তারা কাপড় টাখনু পর্যন্ত পরিধান করে, তবে সে তাদের অনুরূপ পরিধান করবে। কেননা তারাও তো সুন্নতের উপরই রয়েছে।

প্রশ্ন ১১: রাফিদ্বীদের তাকফীর করার বিধান কী এবং নির্দিষ্ট কোনো রাফিদাহ (শিয়া) ব্যক্তিকে কি কাফির বলা হবে?

উত্তর: আমরা বলি, যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়, যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকা, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা, অথবা মৃতদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, অথবা শির্কের অন্যান্য প্রকারসমূহের কোনো একটিতে লিপ্ত হয়, তাহলে সে কাফির। সে যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন। বিষয়টি তাওহীদ, শির্ক, ঈমান ও কুফরের সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং যে ব্যক্তি কুফরী কাজ করবে, সে কাফির। তবে যদি পূর্বোক্ত ওজরসমূহের কারণে সে ওজরগ্রস্থ হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। সে যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন।

---

[31] হাঁটু পুরুষের সতর নয়। তবে জমহুর উলামাদের মত হলো পুরুষের থাই সতর। তাই সতর্কতাবশত থাই যাতে উন্মুক্ত না হয় তাই পায়ের গুলের উপর উঠাতে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন ১২: কুফরের প্রকারসমূহের মধ্যে কুফরুশ শাক (সন্দেহজনিত কুফর) নামে কোনো প্রকার আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগ কখনো কথা দ্বারা, কখনো কাজ দ্বারা, কখনো বিশ্বাস দ্বারা এবং কখনো সন্দেহ দ্বারা সংঘটিত হয়। যদি সে কুরআনের কোনো বিষয় বা সুন্নাহর কোনো বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে যে তা সত্য কিনা, অথবা বলে তা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপন্থী, যদি সে আল্লাহর কালাম বা তাঁর রাসূলের কালামে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে এটি ইসলাম দ্বীন থেকে রিদ্দাহ হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন ১৩: যে মূলনীতি বলা হয়: “যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির বলে না সে নিজেও কাফির” - এটা কি কেবল মূল কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নাকি মুরতাদ মুসলিমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? যেমন কতিপয় আলিম ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত সালাত পরিত্যাগকারীকে তার ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কাফির বলেন। আমরা কি এই মূলনীতি প্রয়োগ করব?

উত্তর: যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির বলে না সে তার কর্মে সন্তুষ্ট এবং সে যা করেছে তাকে কুফর বলে মনে করে না। সে বলে মৃতদের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করা অথবা কবরবাসীদের ডাকা কিংবা এতদসদৃশ কাজ কুফর নয়। তাহলে সেও তাদের মতই কাফির। কারণ সে তাদের এসব কাজের উপর তাদেরকে সমর্থন করেছে, তাতে তাদের সাথে একমত হয়েছে এবং সেটাকে কুফর বলে গণ্য করেনি। ফলে সে তাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে, আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। যদিও সে নিজে এ কাজ না করে থাকে। কিন্তু যখন সে বলে এটি কুফর নয়, তখন সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা সে তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে, তাকে পবিত্র মনে করেছে এবং তাকে সঠিক হিসেবে গণ্য করেছে। তবে যদি সে এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকে, তাহলে তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হবে।

প্রশ্ন-১৪: প্রশ্নকারী বলছেন, এক ব্যক্তি কোনো এক খ্রিস্টানের অজান্তে তার কিছু অর্থ নিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সে তাওবা করেছে, কিন্তু খ্রিস্টান ব্যক্তিটিকে সে আর খুঁজে পাচ্ছে না। এখন তার করণীয় কী?

উত্তর: কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি কোনো কাফিরের সম্পদও আত্মসাৎ করা জায়েয নয়। তবে একমাত্র আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল হিসেবে কাফিরদের সম্পদ গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। এছাড়া অন্য

কোনোভাবে সাধারণ মানুষের সম্পদ, চাই তারা কাফির হোক বা মুসলমান, গ্রহণ করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সময় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও গনীমতের মালই কেবল কাফিরদের থেকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু খিয়ানত করা, ধোঁকা দেওয়া এবং চুরি করা মুসলমান বা কাফির কারো সাথেই জায়েয নয়। কোনো মুসলমান যদি চুরি করে অথবা কোনো কাফিরের মাল আত্মসাৎ করে, তাহলে তা ইসলামের জন্য কলঙ্ক ও গ্লানির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তার এই কর্ম ইসলামের নামে দায়ী করা হবে। প্রকৃত মুসলমান তো আমানতদার হয়, সে কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না, ধোঁকা দেয় না এবং কারো সম্পদ চুরি করে না। এটাই হলো সেই মুসলমান যে সঠিকভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে। আর এখানে যা ঘটেছে তা একটি ভুল ও অন্যায় কাজ, কারণ সে অন্যায়ভাবে পরের সম্পদ গ্রহণ করেছে। এখন সে যদি মালিককে খোঁজাখুঁজি করেও না পায়, তাহলে এই অর্থ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হলো, সেটা কোনো জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করে দেওয়া অথবা কোনো সত্যিকারের অভাবী মানুষকে দান করে দেওয়া।

প্রশ্ন ১৫: আমরা যখন যুবকদের খারেজীদের সম্পর্কে সতর্ক করে উপদেশ প্রদান করি, কিন্তু যখন তাদের সামনে এমন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয় যারা এই মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত, তখন

তারা আমাদের সাথে মতবিনিময় করতে ও আমাদের কথা মানতে ইতস্তত ও দ্বিধাবোধ করে। এ ব্যাপারে আপনার উপদেশ কী? এবং এই ধরনের লোকদের নিকট সঠিক ইলম পৌঁছে দেওয়ার উপায়ই বা কী?

উত্তর: বিষয়টি ব্যক্তিবিশেষের বিষয় নয়, বরং এটি একটি মতবাদের বিষয়। আমরা খারেজীদের মতবাদ থেকে সতর্ক করি, তাদের সন্দেহ ও ভ্রান্তিগুলো উল্লেখ করি, সেগুলোর খণ্ডন করি এবং তার জবাব প্রদান করি। আর ব্যক্তিদের ব্যাপারে হল, তাদের আহ্বান জানানো হবে, তাদের উপদেশ দেওয়া হবে, হয়তো তারা নসীহত কবুল করবে। কিন্তু যদি তারা উপদেশ গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের পরিত্যাগ করা হবে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদের ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ থাকবে।

প্রশ্ন ১৬: একজন প্রশ্নকারী, যিনি এই দেশের নন, তিনি বলছেন যে আমাদের দেশে খারেজী সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে, যারা ব্যাপক ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। তাদের কেউ কেউ এই বছর রমযান মাসে তাওহীদপন্থী মুসল্লিদের তারাবীহর নামাযরত অবস্থায় হত্যা করেছে। এই ধরনের লোকদের হত্যা করা কি জায়েয? এবং তাদের সাথে লেনদেন ও আচরণের হুকুম কী?

উত্তর: হ্যাঁ, এটাই খারেজীদের মাযহাব বা মতবাদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন যে:

«يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ»

“তারা ইসলামের অনুসারীদের হত্যা করে এবং মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দেয়।”[32] পক্ষান্তরে তাদের হত্যা করার দায়িত্ব যিনি পালন করবেন তিনি হলেন ওলীউল আমর বা শাসক। ব্যক্তি বিশেষ এ দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। কারণ এতে করে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। যদি তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাও এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করে, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করে এবং তোমাদের উপর হামলা করে, তাহলে এই নৈরাজ্যের ফলে ব্যাপক রক্তপাত সংঘটিত হবে। বরং এর বিধান ওলীউল আমরের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, যদি কোনো ওলীউল আমর বিদ্যমান থাকে, যিনি হদ কার্যকর করেন এবং শাস্তি প্রদান করেন। তাহলে বিষয়টি তার নিকট পেশ করা হবে। আর যদি কোনো ওলীউল আমর না থাকে, তাহলে কাউকে হত্যা করে তা বাস্তবায়ন করা কারো জন্য জায়েয নয়। কেননা এর ফলে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হবে।

---

[32] বুখারী: ৩০৯৫, মুসলিম: ১৪৯৮, নাসায়ী: ২৫৩১, মুসনাদে আহমাদ: ১৮৫৪, ১৯০৯

প্রশ্ন ১৭: যে ব্যক্তি সবে ইলম অন্বেষণের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তার জন্য কি এমন কাউকে সরাসরি কাফির বলে হুকুম দেওয়া জায়েয হবে, যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলামে নিশ্চিতভাবে কুফরী বলে জ্ঞাত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কোনো কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি স্বয়ং আল্লাহকে গালি দেয় এবং তা মুখে উচ্চারণ করে?

উত্তর: হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে গালি দেয় অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, কিংবা ইসলামের কোনো ভঙ্গকারী কাজে লিপ্ত হয়, তার কৃতকর্মের ভিত্তিতেই তার উপর হুকুম দেওয়া হবে। তবে যদি তার কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর থাকে, তাহলে তাকে নসীহত করা হবে এবং তার সামনে বিষয়টি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হবে। অথবা যদি তার মনে কোনো প্রকার সংশয় থেকে থাকে, তাহলে তার ভুল ও গোমরাহী তাকে বুঝিয়ে বলা হবে। যদি সে তা মেনে নেয়, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আর যদি সে তা গ্রহণ না করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং উপদেশদানকারী দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেল।

প্রশ্ন ১৮: কাফিরদের সাথে মূল সম্পর্ক হবে যুদ্ধের নাকি শান্তির? এবং কাফিরকে কি তার কুফরের কারণে হত্যা করা হবে, নাকি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার কারণে?

উত্তর: এটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মাসআলা। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অবশ্যই মুসলিম পতাকাতলে পরিচালিত হতে হবে, যা মুসলিম শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান বাস্তবায়ন করবেন। আর এটি সেই নীতি ও কৌশলের অন্তর্ভুক্ত যা মুসলিম শাসকের নির্দেশ ও পরিচালনার অধীন। এটাই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সঠিক পদ্ধতি। আর কাফির যদি নিজ কুফরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তার কুফরের ক্ষতি অপর কারো নিকট না পৌঁছে, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না। এ কারণেই অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় না, কাফির নারীকে হত্যা করা হয় না, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুকে হত্যা করা হয় না এবং গির্জা বা মঠে বসবাসকারী সংসারত্যাগী পাদ্রীকে হত্যা করা হয় না। কেননা এদের কুফর শুধু তাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং অপর কাউকে আক্রান্ত করে না। পক্ষান্তরে যখন কাফির ব্যক্তি কুফরের দিকে আহ্বান জানাতে থাকে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

প্রশ্ন ১৯: যে ব্যক্তি বলে, আমি অমুক স্থানে বা তমুক স্থানে জিহাদের জন্য যাই, কারণ তারা সঠিক মতাদর্শের উপর জিহাদ করছে, তার জবাব বা প্রত্যুত্তর কীভাবে দেওয়া হবে?

উত্তর: মুসলিমদের ওলীউল আমরের অধীনে মুসলিম পতাকাতল ব্যতীত কোনো জিহাদ নেই। অন্যথায় তা বিশৃঙ্খলা, জিহাদ নয়। এর দ্বারা মুসলিমদের যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা অর্জিত কল্যাণের চেয়ে অনেক বেশি। বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত ঘটে, অথচ এর পেছনে কোনো কল্যাণ বাস্তবায়িত হয় না।

প্রশ্ন ২০: যে ব্যক্তি শিরকী কাজ করে, যেমন নিজের রুগ্ন ব্যক্তির আরোগ্য কামনায় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকে, আমরা কি বলব যে এটা শিরক, নাকি বলব যে তার কাজটি শিরকী কাজ, অথচ সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং রোযা রাখে ও হজ করে?

উত্তর: যদি তার কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর না থাকে, তাহলে সে মুশরিক। পক্ষান্তরে যদি সে অজ্ঞ হয়, অথবা অন্ধ অনুসরণকারী হয়, কিংবা তার নিকট এমন কোনো ভুল ব্যাখ্যা বিদ্যমান থাকে যাকে সে সঠিক মনে করে, তাহলে তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলা হবে। এরপরও যদি সে নিজের অবস্থার উপর অনড় ও অবিচল থাকে, তাহলে তার উপর মুশিরকের হুকুম প্রয়োগ করা হবে। কারণ এমতাবস্থায় তার ওজর দূর হয়ে গেছে।।

প্রশ্ন ২১: কোনো ব্যক্তি কিছু কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, যেমন সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, ব্যভিচার এবং অন্যান্য গুনাহ, আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। এই কবীরা গুনাহসমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার

পদ্ধতি কী? আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুন এবং আপনার পদক্ষেপসমূহ সঠিক করুন।

উত্তর: যার থেকে এই কবীরা গুনাহসমূহ সংঘটিত হয়েছে, যদি এসব কবীরা গুনাহ তার নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় যেমন মদ পান, চুরি এবং এতদসদৃশ বিষয়, তাহলে সে আল্লাহর নিকট তাওবা করবে নিজের ও আল্লাহর মাঝে গোপনে। এবং যাদের উপর যুলুম করেছে বা যাদের মাল নিয়েছে তাদের নিকট মাল ফিরিয়ে দেবে। আর যদি তা আল্লাহর হদসমূহের কোনো একটির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে এ বিষয়ে শরয়ী আদালত এবং ওলীউল আমরের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কিন্তু যদি সে নিজেকে গোপন রাখে এবং তার উপর মানুষের কোনো হক না থাকে আর সে আল্লাহর নিকট তাওবা করে, তাহলে এটাই যথেষ্ট এবং গোপন রাখাই কাম্য। সুতরাং সে নিজের ও আল্লাহর মাঝে আল্লাহর নিকট তাওবা করবে, আমলকে সুন্দর করবে এবং সৎ আমল অধিক পরিমাণে করবে। আর আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন। (সমাপ্ত)